তীর্থ তাঁর পদে পদে

রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম ভাবনা

ড. বনবাণী ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	দিয়েছে আমার নাড়ীতে অনির্বচনীয়ের স্পন্দন	১১
প্রথম অধ্যায়	ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ রবীন্দ্র-ধর্মভাবনার উৎস-সন্ধানে	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	ধর্ম আমার মাথায় রেখে রবীন্দ্র-ধর্মভাবনায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব	৪৩
তৃতীয় অধ্যায়	দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবন ও ধর্মবোধ	৭২
চতুর্থ অধ্যায়	সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় ধর্মবোধ	৯১
পঞ্চম অধ্যায়	ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রবীন্দ্রচিত্তে	১২৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র রবীন্দ্র-ধর্মভাবনা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনীষা	১৬০
সপ্তম অধ্যায়	ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে রবীন্দ্র-ধর্মভাবনায় শোষণ থেকে উত্তরণের দিশা	২০৭
অষ্টম অধ্যায়	দুঃখই হোক তব বিত্তমহান রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা ও ধর্মভাবনা	২৩১
নবম অধ্যায়	গান দিয়ে দ্বার খোলাব সঙ্গীতের দর্পণে	২৪৬
উপসংহার		২৬৪
বর্ণানুক্রমিক সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী		২৯৪

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ মুনি-ঋষির দেশ বলে কথিত। পুরাণের পাতায় আছে মুনি-ঋষির অসামান্য সাত্ত্বিক বর্ণনা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই, "সৌম্য-সহাস, তরুণ বয়ান, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান" বলে সন্ন্যাসী উপগুপ্তর ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেই সৌম্য-সমাহিত এক তপোবন-ঋষির ছবিআঁকা হয়ে যায় মনে। আলোচনা-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে আধ্যাত্মমার্গের পর্যটক বলে একধরনের রবীন্দ্রসংস্কার তৈরি করারও আয়োজন আছে। তপোবন, ধ্যানমগ্নতা, ঈশ্বরসাধনা আর নিজের প্রশান্তকান্তি ঋষি মূর্তির অনুষঙ্গ-উৎসে রয়েছে তাঁর ধর্মচেতনা। রবীন্দ্র-মানস জুড়েও রয়েছে তাঁর ধর্মবোধ।

কবি জানতেন কি না জানা নেই— নিজেই তিনি সেই প্রশান্তকান্তির এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সৈয়দ মুজ্‌তবা আলির লেখায় জানা যায় শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা মারাঠি একটি ছাত্র অপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে দেখে প্রথমে সাধু-দরবেশ বলেই ভুল করেছিল। এমনকি সাধু-সন্ন্যাসীকে দান করে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ সংবরণ না করতে পেরে তাঁকে একটি আধুলিও দিয়েছিল ছাত্রটি।

রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে প্রায় কারর যে বিস্ময়ের সীমা নেই, একথা সর্বজনস্বীকৃত। বিস্ময়ের রেখচিত্র ধরা আছে বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের লেখায়। "বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাদের ভাষার মহাকবি ও মহাসাহিত্যিক নন। বিগত একশ বছরে বাঙালীর মন ও চিন্তা যে আকার নিয়ে গড়ে উঠেছে তার এক অতি বড় অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাবে ঘটেছে। আমাদের বাংলা ভাষা ও তার গড়নের চিন্তা, কাব্য ও তার ছন্দ ও রীতির চিন্তা, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য ও তার পদ্ধতি ও উপায়ের চিন্তা, পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের চিন্তা — সব কিছু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী বিরাট প্রতিভার স্পর্শে মূর্তি ও প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমরা মুখে যা বলি, লেখায় যা লিখি, তার কতভাগ পদ ও উপকরণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে এসেছে ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের দেশের আকাশ, তাতে রৌদ্রমেঘের খেলা, দেশের তরুলতা শষ্যের শ্যামলতা, তার ঋতু বৈচিত্র্য এ কি আজ আমরা কেবল নিজের চোখে

দেখছি? মহাকবির দৃষ্টি ও কল্পনা সে দেখায় কতখানি জুড়ে আছে (রবীন্দ্রায়ন পুলিন বিহারী সেন পৃ. ৬৯৬)?" তাঁর আত্মজন থেকে শুরু করে উত্তরকালের কবি-সাহিত্যিক- বুদ্ধিজীবী-গবেষকেরা নিজ নিজ ঢঙে সেই বিস্ময়ে অবগাহন করেছেন। এভাবেই গাঁথা হয়ে গেছে নানা রবীন্দ্রনাথের মালা— ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের বর্ণময় বিকাশ। তার মধ্য দিয়ে কোন্ রবীন্দ্রনাথ কতখানি বিকশিত হয়েছেন— সে জিজ্ঞাসাও থেকে যায়। ইতিহাস যেমন নিরবচ্ছিন্ন ঘটনার প্রবাহ— সমুদ্র যেমন অতল অপার, রবীন্দ্রনাথও তেমনি এক অন্তহীন অস্তিত্ব যা বহু বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। তবু কি তাঁর মানসলোকের সম্পূর্ণ হদিস পাওয়া গেছে বলে দাবি করা যায়? সেই অন্তর্লোক আজও আলো-আঁধারের ছায়ায় ঢাকা— কতকটা বোঝা যায়, কতকটা যায় না। রবীন্দ্রনাথ খণ্ডিত অন্যের রচনায় যেমন, নিজের রচনাতেও। কখনও দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, কখনও চারণিক রবীন্দ্রনাথ, কখনও বা দরদী রবীন্দ্রনাথ, কখনও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ— এভাবেই বিভিন্ন মূর্তি রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এবং সেই খণ্ড মূর্তিটিই সমগ্র বলে বহু সময়েই ভ্রম হয়। এমনকি অন্তরঙ্গের খোঁজ না রেখে বহিরঙ্গকেই সম্পূর্ণ করে দেখারও দৃষ্টান্ত আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাই কবির আকুলতাও লক্ষণীয়—

"বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে
আমায় দেখো না বাহিরে।"

এই বহির্দৃষ্টি থেকে কবির সৃষ্টিকে বিচার না করার আবেদন রেখেছেন কবি। রবীন্দ্রসত্তাকে মূলত ধর্মীয়-রসে সিক্ত করে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখার ঝোঁক প্রবল। তার বাস্তব কারণও একান্ত দুর্বল নয়। অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস তাঁর 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "কবি রবীন্দ্রের কবিতায় তত্ত্ব-আরোপ দুটি প্রবল বাহ্যকারণে ঘটেছে। প্রথমত, তাঁর জীবনসূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত পিতার অস্তিত্ব এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও উপনিষদ চর্চার পরিবেশ ছিল বলে এবং তিনি নিজেও কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন বলে তাঁর প্রথম জীবনের যে কোনো কবিতায় তত্ত্ব আরোপ অতি সহজেই করা হয়েছে, এবং প্রকৃত কবিধর্মের সঙ্গে সহানুভূতিমূলক পরিচয় না থাকার ফলে বাহ্যত দুর্বোধ্য কবিতাগুলিতে ঐ প্রকার তত্ত্ব আরোপ করে একটা সহজ সমাধানের পথে সমালোচকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত, কবির বহু কবিতায় ভঙ্গির দিক থেকে বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদ রচনার প্রকৃতি গৃহীত হওয়ার ফলে কবির উপলব্ধ রসবস্তু বৈষ্ণবীয় ঈশ্বর বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।" (পৃ : ৭২)

কবিদের মানসলোকে যাত্রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমাননির্ভর হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকার অপরকে দিয়েছেন তাঁর আত্মদর্শনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে। কবির নিজের অনুভবের কথা 'আত্মপরিচয়'-এ যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেই পরিচয়ই কবি রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে থাকা কুহেলিকা ছিন্ন করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু বহু সময়েই গবেষক-সমালোচক-বিশ্লেষকগণের একাংশ তাকে অতিক্রম করে একটা আলো-আঁধারি মূর্তি তৈরি করে এক দুর্জ্ঞেয় রবীন্দ্রনাথের অবয়ব সৃষ্টি করে কার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন বোঝা দুষ্কর। বিগত শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম রাস্‌কিনের সতর্কবাণী শিরোধার্য— "Be sure that you go to the author to get at his meaning, not to find yours." এবং তাহলে প্রকৃত ও অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ঋজু উপস্থাপন সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে 'জীবনদেবতা এক রহস্যঘন উপাদান বলে মনে করা হয়ে থাকে। জীবনদেবতাই ব্রহ্ম-ঈশ্বর-বিশ্বনিয়ন্তা— এমন বহু উপলব্ধি ঘিরে আছে কবির জীবনদেবতাকে। অথচ কবি নিজে কখনই জীবনদেবতার উপর কোনো ঈশ্বরতত্ত্বের রঙ লাগান নি।

তৃণ রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।

এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।
লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ কিরণ কণিকা
গাঁথনি কি মোর জীবনে?
হে চিরপুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নতূন করিয়া
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

কবির নিসর্গমগ্নতা— তাঁর সৌন্দর্যসত্তার গভীর উপলব্ধি এবং তার সাথে তাঁর আবহমানকালের নিবিড় আত্মীয়তা তাঁর গভীর অনুরাগ কখনও স্পন্দিত বিস্ময়ে, কখনও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আবরণে জীবনদেবতার রূপ নিয়েছে। মানসীর এই নিসর্গ-একাত্মতা আরও পরিস্ফুট হয়েছে উৎসর্গের 'প্রবাসী'তে— 'মনে হয় যেন সে ধুলির তলে/যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে।' জীবনদেবতা কবির আত্মশক্তির ইতিবৃত্ত। মানসী কাব্যের জীবনদেবতা এক সৌন্দর্যমূর্তি, রোমান্টিকতার আবরণে ঢাকা— কিন্তু চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' তাঁর সমাজ জীবনবোধের পরিচয়ে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা যেখানে জীবনদেবতাই তাঁর পূর্বতন সৌন্দর্যময়ীর এক পরিপূর্ণরূপ পেয়েছে। এই সত্তাই তাঁর অন্তরবাসিনী হয়ে তাঁর কাব্যসত্তাকে পরিচালিত করেছে। আত্মপরিচয়ে কবির স্বীকারোক্তি— "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন— সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতোবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" (রবীন্দ্ররচনাবলী ১১শ খণ্ড, পৃ: ১২৭)।"

ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতায় ঐশ্বরীক কোন অস্তিত্বের সন্ধান করা অর্থহীন। জীবনদেবতার সম্যক্ উপলব্ধির পথে বাধা সম্ভবত এর ভাবালুচরিত্র ও রসভোক্তার বিশ্ববীক্ষণের সীমাবদ্ধতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছুকেই বিচ্ছিন্নভাবে দেখাটাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা বরদাস্ত করে না।

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না— কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম অনুভবে পাওয়া যায় আধুনিকতম দর্শনেরই ইঙ্গিত— "নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি। এইটিকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে

এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই— সেই জন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়।" (রঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, পৃ:১২৯)।

... আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত।

"অনাদি-উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে।"

— এই অনুভবেরই আন্তরিক প্রকাশ। (সঞ্চয়িতা পৃ: ৪৬৬)

নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিশ্বজগৎকে কবি নিবিড় করে গ্রহণ করতে পেরেছেন— এই অনুভবের অসাধারণ ক্ষমতাই কবির অসামান্য সৃজনীশক্তির উৎস। এই সৃজনীশক্তিকেই কবি জীবনদেবতা বলে অভিহিত করেছেন। কবির নিজের ভাষায়— "এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনীশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্ম জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি তাহাকেই জীবনদেবতা নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম— "ওহে অন্তরতম..." (রঃ রচনাবলী ১১শ খণ্ড, পৃ: ১২৯)।

জীবনদেবতা সম্পর্কিত কুহেলিকা উদ্ঘাটিত হলে— রবীন্দ্রনাথের দেবালয়ে থেকে যায় তাঁর নিরাকার ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-চেতনা প্রধানত তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি, পরে যদিও নিজের বলে তাকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। আশৈশব উপনিষদের সাথে তাঁর যে একান্ত পরিচয়— তার প্রভাবকে কবি অস্বীকার করেননি কখনও। কিন্তু সেই প্রভাব কত গভীর? রবীন্দ্রসমালোচক অনেকের ভাষ্যে কবি হয়ে উঠেছেন উপনিষদ অনুসারী কবি এমনকি উপনিষদের নির্দিষ্ট বাণীকেই তাঁর কাব্য রচনার মূলে রয়েছে বলে স্থির সিদ্ধান্তের প্রমাণ রাখা হয়। এই সিদ্ধান্ত কবিপ্রতিভার অবমূল্যায়ন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের সাথে যাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রান্ত-কৈশোরে ও যৌবনসমাগমে তাঁর মধ্যে রোমান্টিকতা প্রবল না হয়ে যায় না। তাঁর সৌন্দর্যব্যাকুলতা তাঁর অনিঃশেষ নিসর্গ-প্রীতি তাঁকে নতুন নতুন কল্পলোকে নিয়ে চলেছে— উপনিষদের তত্ত্বকথার সাধ্য নেই তার গতি প্রতিহত করে। কবি উপনিষদের তাত্ত্বিকতার থেকে অনেক বেশি আকৃষ্ট হতেন মন্ত্রগুলির ধ্বনিমাধুর্যের প্রতি। ফলে তাঁর রচিত কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়া— তাঁর সাহিত্যে ব্রহ্মবাদ প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। সাধারণভাবে কবি অবশ্য অস্তিত্ববাদী এবং নির্দিষ্টভাবে ব্রহ্মবাদী।

রবীন্দ্রচেতনার অনেকখানি জুড়ে আছে তাঁর ধর্মবোধ, তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস। রবীন্দ্রধর্মভাবনার কেন্দ্রে ঈশ্বর না মানুষ, কতটা ঈশ্বর, 'কোন অর্থে কতটাই বা মানুষ'— অনুসন্ধান তারই।

'বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় যে ভূমি' সেই তো স্বর্গভূমি।" — এই আবরণহীন অকুণ্ঠ প্রত্যয় ঘোষণা একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে চায়। 'ভূমৈব সুখম ন অল্পে সুখমস্তি'— উপনিষদের এই বাণী নিয়ে যে তাঁর জীবনপ্রত্যূষ থেকে সত্যানুসন্ধান— দীর্ঘজীবনের পথ-পরিক্রমায় কবির সৃষ্টিতে সেই 'ভূমা' 'মানবভূমায়' পরিণত হয়েছে। সুখ-দুঃখের তরঙ্গাঘাতে জীবনের লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর এই চেতনার উত্তরণ ঘটেছে। "পৃথিবীর পূর্ণতম মানবরূপে সমগ্র অতীতের পাদপীঠতলে ভর করে অনাগত ভবিষ্যতের ক্রমায়ত পরিধির দিকে মাথা তুলে অনন্তকালের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ (দেশ পত্রিকায়, রবীন্দ্রচর্চা, পৃ: ১০৩)।"

প্রথম অধ্যায়

ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ

রবীন্দ্র-ধর্মভাবনার উৎস সন্ধানে

ঋণের মহিমা-কীর্তন প্রায় অশ্রুত। কিন্তু সংসারে এমন ঋণও আছে, যা স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং অপরিশোধ্যও। সেই মহৎ-ঋণের আধার স্বকাল— স্ব-পরিবার।

সাহিত্যে যেমন সমাজের চলচ্ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি মহৎ সৃষ্টির পিছনে সলতে পাকানোর পর্বে থাকে স্রষ্টার জন্মলগ্নের দেশকাল-পরিধি— থাকে তার বেড়ে ওঠা। আর এই বেড়ে ওঠার ইতিবৃত্তে থাকে তার পরিজন-পরিবারের পরম্পরা। রবীন্দ্রনাথ ঋণী তাঁর কালের কাছে, তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যের কাছে। হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ যেমন সত্য, তেমনি পাদদেশ যে মাটি আঁকড়ে আছে তাও তেমনি সত্য। রবীন্দ্রনাথের অনন্যতায় এ ঋণ বিলীন হতে পারে কিন্তু অমৃত হতে পারে না।

কল্পনার পাখা বিস্তার করে কবি কি নিজের কাল বদল করে নিজেকে দেখেননি? কালের স্বাভাবিকতাকে তিনি প্রসন্নমনে গ্রহণ করেছেন। সত্যিই যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়েছেন কালিদাসের কালে, তাহলে তার স্বাভাবিক পরিণতি কি? কবিই সেই কালসৃষ্টির রূপ দিয়েছেন। বিশ্ব সেন, দেবদত্ত অথবা বসুভূমি নামে কবি হয়তো উজ্জয়িণীর দশম রত্ন হতে পারতেন কোনোমতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে ওঠা হত না। স্বকালের অমোঘ বাধ্যবাধকতা সেটাই।

"প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিশেষ ভূখন্ডে, বিশেষ কালখন্ডে। তারপর এই সাধনার বেগে বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষে পৌঁছায়, জন্মগত ভূখন্ড ও কালখন্ডকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে পৌঁছায়। যাহাদের সাধনবেগের সুকৃতি আছে তাহারাই এইরূপ ভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের মূলে এই বিশেষ ভূখন্ড ও কালখন্ডের বোধ (রবীন্দ্রায়ণ : পুলিন বিহারী সেন ১ম খণ্ড : পৃ. ৩)।"

১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল, তার শির অভিষিক্ত হয়েছে এক মাহেন্দ্রক্ষণের মহিমায়। পশ্চিমে তখন রাশি রাশি আলোর

হাসি। ইতিহাসের ভিত কাঁপিয়ে পশ্চিম দিগন্তে তখন মহাজাগরণের আলোড়ন— সেই আলোর শীর্ণছটা সাগর-অরণ্য-পর্বত পেরিয়ে পূর্বগোলকে এসে পৌঁছেছে। পূবের দুনিয়ার বন্ধ দরজায় নাড়া দিচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-মুক্তি-বুদ্ধি—একটু একটু করে আগল-মুক্ত হচ্ছে দ্বিধান্বিত মন। জেগে উঠছে ঘুমন্ত মণীষা রেনেসাঁসের মহাভিঘাতে।

শুরুর থেকে শেষ তো আলাদাই। পাশ্চাত্যের মহাজাগরণ তো শুধু জ্ঞান-পিপাসায় থেমে থাকেনি— শুষ্ক বুদ্ধি, কঠিন তর্কের ঘেরাটোপে যদি আবদ্ধ থাকত সেদিনের সেই ঘুম-ভাঙা অমিত-শক্তি মানব ইতিহাস অন্য হত। জ্ঞানের দেউড়ি পার হয়ে রেনেসাঁ পৌঁছে গেছে জনতার প্রান্তরে—অধিকার আর অস্তিত্বের দুর্মর ঘোষণায়। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণে জর্জরিত বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ ক্রমশ তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে কোম্পানী-শাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে লাগল। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহের মতন খণ্ডকালের সংগ্রামগুলি ভাবীকালের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের নায়ক ছিল সিপাহীরা— কিন্তু সেই বিদ্রোহই তার সমস্ত ভ্রান্তি ও ত্রুটি নিয়েও ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদায় ভূষিত। এ বিদ্রোহে সিপাহীরা পরাজিত কিন্তু দেশব্যাপী জ্বালিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার অগ্নি-শিখা-জাগিয়ে দিয়েছে স্বাজাত্যবোধ।

শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ মৃদু গতিতে ভারতবর্ষের তীরে এসে মিলিয়ে গেল। ১৮৫২-১৮৫৮ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পের গোড়াপত্তন হল রেলপথ, পাট কল, চা বাগান, কাপড়ের কলের শুরুর মধ্য দিয়ে। একদিকে গড়া আর একদিকে ভাঙা। অতি প্রাথমিক স্তরের এই শিল্পগুলি যেমন আধুনিক শিল্পের জয়যাত্রা সূচনা করেছে তেমনি ভারতবর্ষের যে সনাতন গ্রামীণ অর্থনীতির একটা সামঞ্জস্য পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ বনিয়াদ ছিল তা তছনছ হতে লাগল। এই প্রবল ভাঙা-গড়া শুধু কৃষি আর শিল্পের রূপ পেল না, তা নাড়িয়ে দিল শতাব্দী-পুঞ্জিত সমাজের আবর্জনা স্তূপকে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রতিদিনের জীবন-যাপনের এই মহারূপান্তর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম সমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়েছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ: ২২৪-২২৫)

শিবনাথ শাস্ত্রীর কলম থেকে উঠে আসা এই ঘটনাবলী, অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-কুসংস্কার-ধর্মভীরুতা-বিচ্ছিন্নতা আর বশ্যতার কারাগারে ঘুমন্ত একটা জাতির ক্রমিক চিত্তজাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে।

সাগরপারের রেনেসাঁর সেই আলোর নাচন তো এপারে ঝিকমিকিয়ে পড়েনি—এ পারকে রেখেছিল কুণ্ঠিত আভাসে। কিন্তু সেই 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' তো কান এড়িয়ে গেল না প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারের। বঙ্গদেশের প্রথম আলোকস্নাত পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। "সে যুগে ঠাকুর বাড়ীর মতো ধনী এবং অভিজাত পরিবার আরও অনেক ছিল। খুব কম করেও আমরা আরও ত্রিশটি পরিবারের উল্লেখ করতে পারি যাঁরা ধনে মানে ঠাকুর বংশের চেয়ে কোনো অংশে হীন তো ছিলেনই না বরং আরও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব পরিবারও নানাভাবে শিল্পরুচি কিংবা প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবু এতগুলি বাড়ির মধ্যে ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের বেছে নেবার প্রধান কারণ, প্রথমপর্বে এই বাড়ীই ছিল সবার পুরোবর্তিণী। (ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল-চিত্রাদের পৃ : ৫)।"

অন্দরমহলের ঊষার নবীন কিরণের সন্ধান যদি ঠাকুরবাড়ির অন্দরই হয়—তার বারমহল না পেরিয়ে তো সেই ছটা অন্দরমহলে পৌঁছতে পারেনি।

"একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল— সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশেল বেশী নেই। তার মালমশ্‌লা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে।" ছেলেবেলার রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিমতে তার পরিবার। (রবীন্দ্র রচনাবলী ১১শ খণ্ড ১১৮-১১৯)।

'ঠাকুর বাড়ীর কথায়' হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এশিয়াটিক সোসাইটি ও জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ নীলমনি ঠাকুরের নতুন গৃহ নির্মাণ উল্লেখ করে বলেন "১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় দুটি ঘটনা ঘটে যা ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্য সুদূর প্রসারী হয়েছিল (পৃ : ২২১)।" ঠাকুরবাড়ীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সপক্ষে বলা যায় যে, স্পেনীশ শাসনের ফলে ফিলিপাইন তার নিজস্ব সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে স্পেনীশ সংস্কৃতিকেই গ্রহণ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইয়ংবেঙ্গলের আন্দোলন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে ইংরেজ মেকলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎসাহিত হলেও প্রাচ্য সংস্কৃতির যে সম্পূর্ণ বিলোপ হল না, সে ক্ষেত্রে গোটা ভারতীয় সমাজ ঠাকুর পরিবারের কাছে চিরঋণী। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন, বাংলাদেশে যে এমন ঘটলনা তাঁর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম "জাতির জীবনের সন্ধিক্ষণে, ঠাকুর পরিবারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব (ঠাকুরবাড়ীর কথা ২১৫)।"

এই পরিবারের গৌরবময় ইতিহাসের কথা প্রসঙ্গে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একই পরিবারে অনেকগুলি কীর্তিমান মানুষের একত্র সমাবেশ বড় দুর্লভ বস্তু। এ বিষয় ঠাকুর পরিবার অনন্য সাধারণ। এর দ্বিতীয় উদাহরণ ভারতের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ একটি শতাব্দী ধরে এই পরিবারের মানুষ বাংলার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন অধিকার করে এসেছেন। (ঠাকুরবাড়ীর কথা ২১৩)।" ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে দ্বারকানাথ ঠাকুরই প্রথম যিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে মাভৈঃ বলে যাত্রা শুরু করেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পৌত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অন্বেষণ করাটা একেবারে নিরর্থক নয়। দ্বারকানাথ তাঁর যুগের প্রতিনিধি। বাঙালির নবজাগরণের প্রাণপুরুষদের অন্যতম তিনি। "বৈষয়িক সাফল্যে, আধুনিক শিক্ষার উৎসাহদানে, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠে, মেধা চর্চায়, শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতায়, বাণিজ্যবুদ্ধিতে, ভোগে ও চিন্তায় সমানভাবে, বাঙালির পুর্ণজাগরণের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ।" (রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন — সমীর সেনগুপ্ত পৃ : ১১৫) ব্রাহ্মসমাজের আদি রূপ যে আত্মীয়সভা তারই কাজ করতে গিয়ে কালপুরুষ রামমোহনের সাথে তার যোগাযোগ এবং আজীবন বন্ধুত্ব, যদিও তিনি রামমোহনের থেকে প্রায় ২০ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আচার-নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুসরন করে জানা যায় যে প্রথমবার বিলেতে গিয়ে তিনি যে বাড়িতে থাকতেন তার একটি ঘরে গঙ্গামাটি প্রলেপ দিয়ে ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত জপ করতেন। এমনকি জপ শেষ না করে তিনি ডাচেস অফ্ সাদারল্যাণ্ডের সাথে দেখা পর্যন্ত করেননি— বসিয়ে রেখেছিলেন। আবার তিনিই ছিলেন রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রধান সহায়।

সে যুগের যে কোনো জনকল্যাণে দ্বারকানাথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। হিন্দু কলেজ বা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ তার পশ্চাদভূমিতে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে দ্বারকানাথ প্রথমতম ভারতীয়দের অন্যতম ছিলেন। ("রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন সমীর সেনগুপ্ত পৃ. ১১৭)" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর তার অর্থানুকূল্য লাভ করেছে।

একদিকে জনহিতৈষিতা— অপরদিকে বৈভব প্রতিষ্ঠা চরম বিলাস-ব্যসন অমিতাচার তারই সাথে সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা চিন্তার অধিকারী দ্বারকানাথ। স্ত্রী দিগম্বরীর সাথে নিটোল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হয়নি। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী জীবনকে একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও দিগম্বরী যে কোনো পতিব্রতা হিন্দু রমণীর মতন মেনে নিয়েছিলেন না। তাঁর বিলাসিতা ছিল কিংবদন্তীর

মতন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন প্রথমবার বিলেত-প্রবাসকালে দ্বারকানাথকে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা হাতখরচ পাঠাতে হত। আবার, তিনিই চিকিৎসা বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য দুটি ছাত্রকে নিজব্যায়ে বিলেতে নিয়ে যান। সে যুগে অর্থবানেরা জনহিতকর কাজে অর্থব্যয় করে সমাজের খ্যাতির শিখরে উঠত এ দৃষ্টান্ত আরও আছে কিন্তু পশ্চাদমুখী গতিকে সামনে ঘুরিয়ে দেওয়ার মতন সিংহ-হৃদয় সকলের ছিল না— ধনী দ্বারাকানাথের জাতের অনন্যতা সেখানে। ক্ষিতীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া যায়— "আমাদের সেকালের বৃদ্ধ আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে প্রচার আছে যে তিনি কেবল উপস্থিত থাকিতেন না, তিনি সর্বপ্রথম নামে মাত্র শবব্যবচ্ছেদ করিয়া শব স্পর্শের ভয় ছাত্রদিগের মন হইতে অপনোদন করিলেন। তিনি ছাত্র ছিলন না বলিয়া সে কথা কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।" (রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন — সমীর সেনগুপ্ত পৃ : ১১৭) রেনেসাঁর প্রথম আলোর রশ্মিপাত ঘটেছে ভারতপথিক রামমোহনের আজীবন সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উপরে।

সরকারী চাকুরী, নীল ব্যবসা, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, জমিদারী পরিচালনা— প্রভৃতি দ্বারকানাথের অভাবনীয় কর্মদক্ষতার ছাপ দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্রটির জীবনব্যাপী কর্মসাধনার মধ্যে প্রতীয়মান। এই পৃথিবীতে বিশ্বকবিও একজনই। কিন্তু কোন বিশ্বকবির পক্ষে সম্ভব ছিল কি একই সাথে, পিতৃপুরুষের জমিদারী-শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী সংগঠন পরিচালনা আর কবির বীণায় ঝঙ্কার তোলা, যদি না ঐতিহ্যে থাকে দ্বারকানাথের মতন পিতৃপুরুষের বিপুল তরঙ্গায়িত গতি যা যুগকে এক ধাক্কায় এগিয়ে নিয়ে যায় যোজন যোজন দূর? শব-ব্যবচ্ছেদের মতন সংস্কারের সাহস নতুন চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা শান্তিনিকেতনের আধুনিক বিষয় সংযোজনও তার রূপায়ণের জন্য স্বদেশ-বিদেশ সন্ধান কোন এক জায়গায় পিতামহ ও পৌত্রকে এক মাত্রায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রমানসে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবই সব থেকে বেশি। মহর্ষির ধর্মবোধ, একমেবদ্বিতীয়ম ঈশ্বরে বিশ্বাস, জনহিতৈষণা— আবার বিষয়-বৈষয়িকতা নিয়ে মগ্নতা, রবির মননে গভীর ছায়াপাত করেছে। বস্তুত, পিতা-পুত্রের চিন্তা-চেতনায় মননে-স্বপনে এমন নিবিড় ঐক্য, একেবারেই বিরল। পিতার প্রভাবাধীন তাঁর ব্যক্তি জীবন ও বিকাশ স্থানান্তরে আলোচিত হবে।

মহর্ষির পনেরোটি সন্তানের একজনই ভুবনজয়ী হলেও— অন্যরাও কমবেশী যশস্বী এবং নানান অসাধারণ গুণের অধিকারী। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর